দলিত রাষ্ট্রপতি, এবার তবে দলিতদের ঘর আলো ঝলমলে হবে

২৫ জুলাই ভারতের চতুর্দশ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিলেন রামনাথ কোবিন্দ।

বিজেপি শিবির থেকে প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণার পর পুরো নির্বাচনী প্রচারপর্ব জুড়ে তাঁর দলিত পরিচিতিকেই তুলে ধরা হয়েছে। বিরোধী কংগ্রেস শিবিরও দলিত পরিচয়ের ভিত্তিতেই লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমারকে প্রার্থী করেছে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে দলিতের ক্ষমতায়ন বা মুক্তির প্রশ্নটিও প্রচারে এসেছে। কিন্তু দলিত সম্প্রদায় থেকে কেউ রাষ্ট্রপতি হলেই কি দলিতদের উপর নিপীড়ন বন্ধ হবে বা কিছুটা কমবে কি?

রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা দরকার তা কোবিন্দজির ছিল। তা হলে বিজেপিকে কেন প্রার্থীর দলিত পরিচিতি ফেরি করতে হল? এর পিছনে রয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে দলিতদের ক্ষোভ প্রশমনের কৌশল। বাস্তবে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দলিতদের উপর অত্যাচারের ঘটনা মারাত্মক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দলিত নিপীড়ন নিয়ে সংসদে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতেই রয়েছে এর স্বীকারোক্তি। রিপোর্ট উদ্ধৃত করে ২৭ জুলাই দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখেছে, "তালিকায় সবার আগে যে তিনটি রাজ্যের নাম ছিল সেই তিনটি রাজ্যই বিজেপি শাসিত। ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাত। পিছিয়ে ছিল না উত্তরপ্রদেশ।'

দলিত নিপীড়ন বহুমাত্রিক। কোথাও হিন্দু মন্দিরে দলিতদের প্রবেশাধিকার নেই, কোথাও দলিত ব্যক্তির পরিবেশন করা খাদ্য ফেলে দেওয়া হচ্ছে, মৃত গোরুর চামড়া ছাড়ানোর কাজে নিয়োজিত দলিত ব্যক্তিদের উপর শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। কোথাও রোহিত ভেমুলার মতো কৃতী গবেষক ছাত্রকে মানসিক নিপীড়নে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সমাজতাত্ত্বিক শমিত কর ৪ জুলাই বর্তমান পত্রিকায় লিখেছেন, "আমাদের দেশে দলিতদের উপর যে কত ভয়ানক আক্রমণ চালানো হয় তার কিছু পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখলে সম্ভবত অনেকেরই 'মেরা ভারত মহান' কথাটি বলতে কুণ্ঠা হবে। যেমন, 'প্রতি সপ্তাহে আমাদের দেশে অন্তত ১৩ জন দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে হত্যা করা হয়। প্রতি সপ্তাহে ভারতের কোনও না-কোনও প্রান্তে অন্তত পাঁচটি দলিতের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ন্যূনতম ছ'জন দলিতকে অপহরণ করার পরিসংখ্যানও এই তথ্যসূত্রে রয়েছে। ...অন্তত ২১ জন দলিত মহিলা প্রতি সপ্তাহে ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হচ্ছেন। প্রতি ১৮ মিনিটে একজন দলিতের বিরুদ্ধে কোনও না কোনও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে"।

দলিতদের প্রতি বিজেপির দলীয় আচরণও বৈষম্যমূলক। মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ধারক বিজেপি অন্য সময় দলিতদের হিন্দু হিসাবে মূল্য না দিলেও গত উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে দলিত ভোট পাওয়ার জন্য বলেছিল দলিতরাও 'হিন্দু'। কিন্তু ভোটের পর বিজেপি দলিতদের মর্যাদা দিতে নারাজ। এই অবমাননার প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার রুপদি, কপুরপুর, ইঘরি এবং উনালি গ্রামের ১৮০টির বেশি দলিত পরিবার হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আলিগড়ের দুই সহস্রাধিক দলিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অত্যাচারিত, অপমানিত হয়ে এ দেশে ধর্মান্তরিত হওয়ার এই ধরনের ঘটনা আগেও বহু ঘটেছে। বিবেকানন্দের বক্তব্যে তার স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা দলিতদের উপর অত্যাচার বিন্দুমাত্র কমেনি।

নিপীড়ন বন্ধ করতে উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন দলিত সংগঠন প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথকে কালো পতাকা দেখিয়ে স্লোগান তুলেছে— 'দলিত বিরোধী ইয়ে সরকার নেহি চলেগি, নেহি চলেগি'। বিক্ষোভ সামাল দিতে সরকার তাদের 'মাওবাদী' আখ্যা দিচ্ছে, পুলিশি অত্যাচার নামিয়ে আনছে। রাষ্ট্রপতি পদে বিজেপি কেন দলিত প্রার্থী করল— এই প্রেক্ষাপটেই তা বিচার করতে হবে।

জাতিভেদ প্রথার কারণে দলিত সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়, আসলে তারা শোষিত শ্রেণিরই অংশ

বিশেষভাবে বললে শোষিত শ্রেণির মধ্যে অতি শোষিত অংশ।

বর্ণবাদী বিচারে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র— এই চার বর্ণে বিভক্ত। তথাকথিত এই শূদ্রদের জীবিকা নোংরা আবর্জনা, মল-মূত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করা, মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, লোকালয় থেকে মৃত প্রাণীদের সরিয়ে সমাজকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখা। যারা এরকম একটি জরুরি কাজের সঙ্গে জড়িত দুঃখজনকভাবে হিন্দু সমাজের মোড়লরা তাদের অস্পৃশ্য আখ্যা দিয়েছিল। এদেরকেই বলা হয় দলিত।

আধুনিক যুগে সমাজের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এই সমস্ত পেশার আধুনিকীকরণ হওয়া দরকার। একই সাথে এই অস্পৃশ্যতা বা দলিত পরিচয়ের অবলুপ্তিও জরুরি। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কোনও সরকারই যেমন এই পেশার আধুনিকীকরণ করেনি, তেমনই জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি এবং ভোটের স্বার্থে ইন্ধন দিয়ে দিয়ে অস্পৃশ্যতার মনোভাবকে বাড়তে সাহায্য করেছে।

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কিছু সুবিধা পেয়ে দলিতদের মধ্যে মুষ্টিমেয় একটা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশ উচ্চবিত্তে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্পপতিও। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূমিহীন খেতমজুর, অসংগঠিত শ্রমিক। এদের যে অংশ উচ্চবিত্ত হিসাবে মাথা তুলেছে তারাই সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে এম এল এ, এম পি হয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। দলিত অবস্থা থেকে অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে সমগ্র কমিউনিটির মুক্তি কোন পথে তা নিয়ে তারা আদৌ ভাবিত নয়। একইভাবে কংগ্রেস, বিজেপি, বি এস পি, এস পি প্রত্যেকেই এদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্বহীন করে রেখেছে।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বর্ণ বিভেদের অবসান ঘটানো, প্রয়োজন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ। এই কাজটি করার একটা সুযোগ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত উচ্চবর্ণের বুর্জোয়াদের হাতে ছিল। তাঁরা ছিলেন গান্ধীবাদী আপসপন্থী। ফলে ধর্মীয় গোঁড়ামি জাতপাত ইত্যাদির অবসান ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মসূচিকে তাঁরা শুধু এড়িয়ে গেছেন তাই নয়, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার সাথে আপস করেই চলেছেন। ফলে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে এক জাতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর এই প্রভাবশালী উচ্চবর্ণের বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাতেই ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। তারা সমাজের গণতন্ত্রীকরণ করবে, জাতপাতের বিভেদ দূর করবে, তা আশা করাই বৃথা। শোষিত মেহনতি মানুষ যাতে নির্মম বুর্জোয়া শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে মাথা তুলতে না পারে তার জন্য কংগ্রেস-বিজেপির মতো মালিক শ্রেণির দলগুলি জাতপাতের বিভেদে ক্রমাগত ইন্ধন দিয়েছে। অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিও জাতপাতের বিভাজনকে ভোটের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছে। বিজেপি প্রথমে উচ্চবর্ণের হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ান সেজেছিল। তাদের অ্যাজেন্ডায় দলিতরা ছিল ব্রাত্য। পরে তারা দেখেছে দলিত সম্প্রদায়ের ভোট পকেটে পুরতে পারলে তাদের আরও লাভ। কিন্তু তাদের রক্তে যে উচ্চবর্ণের অহঙ্কার মিশে আছে! ফলে থেকে থেকে বেরিয়ে পড়ছে সেই ঘৃণা, সেই বিভাজন।

এই বিভাজন রেখার অবলুপ্তি কারা ঘটাতে পারে? কারা পারে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ করতে? ভোটের স্বার্থে যারা জাত-পাতকে ব্যবহার করে একের বিরুদ্ধে অপরকে প্ররোচিত করে, সেই কংগ্রেস, বিএসপি, এসপি কি পারে এই বিভাজন রুখতে বা দলিতদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে? যারা দলিতকে চিরকাল দলিত রাখতে চায়, তাদের পক্ষে কি এ কাজ করা সম্ভব? এমনকী দলিতদের যে সমস্ত সংগঠন দলিত পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে এবং দলিত পরিচিতি রাখতে চায়, এ কাজ তারাও পারে না। দলিত সম্প্রদায়ের কোনও একজনকে যদি প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও করে দেওয়া হয়, তিনিও পারেন না। কারণ যে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণের স্বার্থে নানা বিভেদকে খুঁচিয়ে তুলে জনগণের ঐক্য ভাঙার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে কোনও দলিতকে বসানো হলে তিনিও তার বিরুদ্ধে যেতে পারবেন না। গেলে তাঁর পদ থাকবে না। ইতিপূর্বে দলিত সম্প্রদায় থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন কে আর নারায়ণন। তাতে কি দলিত নিপীড়ন বিন্দুমাত্র কমেছে? দলিত স্বার্থের চ্যাম্পিয়ান সেজেছিলেন বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাতে দলিত অবস্থা কি দূর হয়েছে?

বাস্তবে দলিত সেন্টিমেন্ট ব্যবহার করে শাসক বুর্জোয়া ও বিরোধী বুর্জোয়া উভয় পক্ষই নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক সংহত করতে চাইছে। এর সাথে দলিতের ক্ষমতায়ন বা দলিত মুক্তির কোনও সম্পর্ক নেই।

রাইসিনা হিলসের বিলাসবহুল রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার আগে স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে কোবিন্দজি বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে মাটির ঘরে তিনি থাকতেন, বর্ষায় ঘরে জল পড়ত। তাঁর বিগত দিনের মতো এই দারিদ্র্য ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ, মানুষের জীবনকে আজও পিষ্ট করছে। যে শোষণ ব্যবস্থার কারণে গরিবের ঘরের চাল ফুটো, তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা যার শীর্ষপদে কোবিন্দজি আজ অধিষ্ঠিত। ফলে দারিদ্র্য বা দলিত অবস্থা ঘোচার কোনও সম্ভাবনাই নেই কোবিন্দজির রাষ্ট্রপতি হওয়ার দ্বারা। যদিও তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছেন, সমানাধিকারের কথা, সকলের সমান সুযোগের কথা। কিন্তু এ তো শুধু বহুবার উচ্চারিত কথামাত্রই।

তা হলে, এই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কীভাবে দূর হতে পারে? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তার দ্বারা শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই আহ্বান তখন সে হিন্দু মজুর, মুসলিম মজুর, দলিত মজুর, ব্রাহ্মণ মজুর, ক্ষত্রিয় মজুর, বৈশ্য মজুর, এ দেশের মজুর, বিদেশের মজুর— এমন কারও কথা আলাদা করে বলে না, সকল মজুরের ঐক্যের কথা বলে। তেমনি হিন্দু পুঁজিপতি-মুসলিম পুঁজিপতি-দলিত পুঁজিপতি— এভাবেও বলে না। সামগ্রিক ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে বলে এবং এদের সকলের সম্মিলিত শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্যই শোষিত মানুষের এই ঐক্য জরুরি। শোষিত জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্যই নিজেদের মধ্যেকার কৃত্রিম বিভেদ দূর করতে পারে। এই সংগ্রামই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে প্রত্যেকের মধ্যে গড়ে দেয় সংগ্রামী ভ্রাতৃত্ববোধ। এই ভ্রাতৃত্ববোধ বা চেতনার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটিয়ে সমাজকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্টরাই। বাস্তবে তাই, শ্রেণি শোষণের অবসান না হলে দলিতদের উপর নিপীড়ন বন্ধ সম্ভব নয়।

উত্তরপ্রদেশের যে দলিত মানুষগুলি বিজেপির আচরণে রাগে-ক্ষোভে-অপমানে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছেন, গভীরে গিয়ে ভাবলে তাঁরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন— ধর্মান্তরকরণ তাঁদের সামাজিক বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না। হাজার হাজার অনুগামী নিয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আম্বেদকর। তবুও বৈষম্যের অবসান ঘটেনি। বাস্তবে সমস্ত ধর্ম বর্ণের মানুষ ধনী-গরিবে বিভক্ত, শোষক-শোষিতে বিভক্ত। এই শ্রেণি বিভাজন দূর হবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই। সেদিন দলিত সহ সব অবহেলিত মানুষই সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রমই হবে সেই সমাজে মর্যাদার ভিত্তি। ফলে দলিতদের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি আজ পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

দলিত পরিবারে কোবিন্দজির জন্ম হলেও দেশে সাম্প্রতিককালে দলিত নিপীড়নের কোনও ঘটনারই তিনি প্রতিবাদ করেননি। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, উরি বা রোহিত ভেমুলার মৃত্যু— ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁর কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি। কারণ তিনি বিজেপির আসল পরিচালক আর এস এস-এর দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাননি। আর এস এস-এর ভাবাদর্শেই তাঁর জীবন পরিচালিত। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি আর এস এস নেতা দীনদয়াল উপাধ্যায়কেই স্মরণ করেছেন। দীনদয়ালের চিন্তাধারা উগ্রহিন্দুত্ববাদী বিভেদমূলক, যা গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী।

প্রধানমন্ত্রীত্বে আসীন আর এস এস-এর ভাবাদর্শী নরেন্দ্র মোদি। এবার রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন আর এস এস ভক্ত রামনাথ কোবিন্দ। উপরাষ্ট্রপতি পদেও আরএসএস অনুগামী বেঙ্কাইয়া নাইডু। দেশের শীর্ষপদগুলিতে আর এস এস কট্টরপন্থীদের অভিষেক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে বিপজ্জনক।

রামনাথ কোবিন্দকে প্রার্থী করে বিজেপি যেমন আর এস এসকে খুশি করেছে, তেমনি তার শাসনে ক্ষিপ্ত দলিত ভোটকেও ম্যানেজ করতে চেয়েছে। কে আর নারায়ণনের রাষ্ট্রপতিত্বে অভিষেক যেমন দলিত সমস্যার কোনও সুরাহা করেনি, তেমনি কোবিন্দজির মধ্যে দলিত স্বার্থপূরণের কোনও আশা নেই।